শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি

ওসিয়ত ও নসিহত

তর্জমা : মওলবি আশরাফ

বাতায়ন
পাবলিকেশন

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি : জীবন ও দর্শন

জন্ম ও পরিবার

হিজরি ১১১৪ সালের ১৪ শাওয়াল, খ্রিষ্টীয় ১৭০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বুধবার বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম ওলিউল্লাহ কুতুবুদ্দিন আহমদ শাহ, তবে আরবদের কাছে আহমদ বিন আবদুর রহিম আর বাকি দুনিয়ায় শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি নামে তিনি পরিচিত। শাহ শব্দটি মূলত সুফি পদবি আর দেহলবি অর্থ দিল্লির অধিবাসী।

তার পিতা শাহ আবদুর রহিম ছিলেন অনেক বড় আলেম, তিনি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগিরের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ইসলামি আইনশাস্ত্রের সর্ববৃহৎ প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে আলমগিরি'-এর সম্পাদনা ও শুদ্ধিকরণের দায়িত্বে ছিলেন। তার মাতা সাইয়িদা ফখরুন্নেসা ছিলেন একজন বিদূষী নারী, শরিয়ত ও তরিকতের রহস্যজ্ঞানী এবং আল্লাহওয়ালা। শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহ) ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর বংশধর, আর তার মায়ের বংশধারা ইমাম মুসা আল কাজিম (রহ)-এর সাথে গিয়ে মিলে।

শিক্ষা-দীক্ষা

তিনি পাঁচ বছর বয়সে মকতবে যান। সাত বছর বয়সে কোরআন হেফজ করেন। এই বছরই আরবি ও ফারসি ভাষার প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করে আরবি ব্যাকরণে মনোনিবেশ দেন। দশ বছর বয়সে আরবি ব্যাকরণের

জটিল কিতাব শরহে জামি পড়ে শেষ করে ফেলেন। এরপর তিনি কোরআন-হাদিসের উচ্চতর পাঠে মনোযোগী হন। তার পাঠ্যসূচিতে তফসির, হাদিস ও ফিকহ ছাড়াও উসুলে ফিকহ, ইলমে কালাম, তাসাওউফ ও সুলুক, মানতেক ও দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং গণিতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি এর অধিকাংশ কিতাব তার পিতার কাছে পড়েন, এবং মাত্র পনেরো বছর বয়সেই পাঠ সমাপন করে ফেলেন। এরপর তার পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় শিক্ষক হিশেবে যোগ দেন।

খেলাফত লাভ ও পিতা-মাতার ইন্তেকাল

কেতাবি তালিমের পাশাপাশি তিনি পিতার কাছ থেকে তাসাওউফের সবকও নিতেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি খুব দ্রুত উচ্চতর মাকাম হাসিল করতে সক্ষম হন। ১১৩১ হিজরিতে, তার বয়স যখন সতের, তখন তিনি পিতার কাছ থেকে নকশবন্দিয়া তরিকার উপর খেলাফত লাভ করেন।

এর কিছুদিন পর একে একে তার পিতা, সৎমা, এরপর তার মা ইন্তেকাল করেন। এই ঘটনা যেমন তাকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, আবার হিন্দুস্তানের মুসলমানের দুর্দশায় মনোবল না হারানোর শক্তি সঞ্চার করে।

হজ ও উচ্চতর শিক্ষা

১১৪৩ হিজরিতে তার মক্কা-মদিনায় যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। তখনকার দিনে হিন্দুস্তান থেকে মক্কা সফর একদমই সহজ ছিল না, তাছাড়া তখন গোটা ভারতজুড়ে হানাহানি ও লুটতরাজ চলছিল। এরপরও

আন্দোলন সংঘটিত হয়, তা হয়েছিল শাহ সাহেবের বিপ্লবী দর্শনের আলোকেই।

'ফুক্কা কুল্লা নিজাম' কী

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহ)-এর চোখের সামনে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তার জীবদ্দশাতেই ইংরেজরা বাংলা দখলের মাধ্যমে উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা ঘটায়। তিনি বিভিন্ন উপায়ে ইসলামি শাসন কায়েমের চেষ্টা করেন, কিন্তু বুঝতে পারেন মুসলমানদের অন্তর মরে গেছে। শূন্য দিয়ে যত বড় সংখ্যাই গুণ করা হোক না কেন, গুণফল যেমন শূন্য থাকে; ঠিক তেমনই মুসলমানদের ঈমান-আমলে সংস্কার না ঘটিয়ে ক্ষমতার মসনদে যাকেই বসানো হোক–কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাই তিনি বিদ্যমান সকল ব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন করে সাজানোর প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ রিফর্মের প্রয়োজনে ডিফর্ম। তিনি নতুন ধারার রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির ধারণা দেন, একই সাথে শরিয়তের নির্দেশনাবলিকে দার্শনিক ভিত্তি দিয়ে 'মাকাসিদুশ শরিয়া' নিয়ে কাজের সূচনা করেন।

তিনি খেলাফতকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন :

১. খেলাফতে বাতেনা (প্রচ্ছন্ন খেলাফত)
২. খেলাফতে জাহেরা (প্রত্যক্ষ খেলাফত)

তার মতে–'খেলাফতে বাতেনা' পরিচালিত হয় তালিম (শিক্ষা), তরবিয়ত (চারিত্রিক উন্নয়ন), তাসাওউফ (আধ্যাত্মিকতা), তাবলিগ (ইসলাম প্রচার), ওয়াজ (উপদেশ), মুনাজারা (ইসলামের জন্য বির্তক

করা), ইলমুল কালাম চর্চা করা, নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাকার আমলগুলির মাধ্যমে। আর খেলাফতে জাহেরা প্রতিষ্ঠিত হয় হুদুদ, কেসাস, জেহাদ, কর ও ট্যাক্স উত্তোলন এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুবিধা প্রদান ইত্যাকার আমলের মাধ্যমে। সোজা কথায়–যে বিধান পালনে শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয় তা হলো খেলাফতে জাহেরা। আর যে বিধান পালনে শক্তি ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয় না, তা হলো খেলাফতে বাতেনা। শাহ সাহেব মনে করেন, প্রথমে খেলাফতে বাতেনা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর খেলাফতে বাতেনাই খেলাফতে জাহেরা বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপট ও পাটাতন তৈরি করে। তাই সবার আগে আমাদের জনে জনে দাওয়াত দিয়ে 'ইনকিলাবে ফর্দ' (ব্যক্তির পরিবর্তন) ঘটাতে হবে। তাহলে এর ভিত্তিতে যে 'ইনকিলাবে নিজাম' (রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন) সংঘটিত হবে, তার মূলে থাকবে শাসক ও শাসিতের সম-শরিকানা, একই সাথে হবে টেকসই ও মজবুত।

তার এই চিন্তাদর্শনের ভিত্তিতেই দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশে যত কওমি মাদরাসা আছে, সবই তার শাখা।

চিন্তাধারা

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহ) ছিলেন মধ্যমপন্থার অনুসারী। তিনি দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির প্রতিবাদ করেন। তিনি ফিকহের নামে যেমন হাদিস এড়িয়ে যাননি, আবার হাদিসের অনুসরণ করতে গিয়ে ফিকহ বাদ দেননি। একদিকে সুফিদের কঠোর সমালোচনা করেছেন, আরেকদিকে নিজেও ছিলেন সুফি। তিনি ওলামায়ে কেরামকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের দিকে আহ্বান করেন, মাজহাব ও মাসলাকের

দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে বলেন। মুসলমানদেরকে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মাতামাতি না করে আমাদের প্রধান শত্রু–ভোগবাদ ও অমুসলিমদের কালচারাল হেজিমনির বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বলেন।

গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহ) শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায়। তার যুগে ফারসি ছিল সাধারণ শিক্ষিতদের ভাষা আর আরবি ছিল এলেমচর্চার ভাষা। এ কারণে তিনি দুই ভাষাতেই লিখেছেন। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনাকর্ম এই :

- ফাতহুর রহমান
- হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা
- আল ফাওজুল কাবির
- ইজালাতুল খফা আন খিলাফাতিল খুলাফা
- ফুয়ুজুল হারামাইন
- আল বুদুরুল বাজিগা
- আল ইনসাফ ফি বায়ানি সবাবিল ইখতিলাফ
- ইকদুল জিদ
- আত তাফহিমাতুল ইলাহিইয়া
- তাবিলুল আহাদিস
- মুসাফফা ও মুসাওওয়া
- আল আকিদাতুল হাসানা
- আল আরবাইন

সন্তানাদি

শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি (রহ)-এর ছিল পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। প্রথম ছেলে শায়খ মুহাম্মদ কৈশোরেই ইন্তিকাল করেন। আর বাকি চার ছেলে–শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি, শাহ রফিউদ্দিন, শাহ আবদুল কাদির ও শাহ আবদুল গনি (যিনি শাহ ইসমাইল শহিদের পিতা)–তারা সবাই প্রতিষ্ঠিত বড় আলেম ছিলেন এবং পিতার ইন্তেকালের পর তার চিন্তাদর্শন প্রচার-প্রসারে বড় ধরনের ভূমিকা রাখেন।

ইন্তেকাল

হিজরি ১১৭৬ সালের ২৯ মোহররম, মোতাবেক ১৭৬২ সালের ২০ আগস্ট রোজ শুক্রবার তিনি দুনিয়া ত্যাগ করে পরম মাওলার সান্নিধ্যে রওনা দেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)

পুরানা দিল্লির বিখ্যাত কবরস্তান 'মিন হাদিসান'-এ তার পিতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে সম্মানিত করুন। আমিন।

সূচিপত্র

ওসিয়তনামা

খুতবা	২১
আকিদা ও আমল প্রসঙ্গে	২২
সৎকাজের আদেশ বিষয়ে	২৩
পীর-মুরিদ প্রসঙ্গে	২৪
সুফি, কালামবিদ ও আমাদের মধ্যকার পার্থক্য	৩০
এবাদত-বন্দেগির উদ্দেশ্য	৩১
কারও জন্য শুধু শরিয়ত, কারও জন্য এরচেয়ে বেশি কিছু	৩৪
সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস	৩৬
শিয়াদের ইমামিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে	৩৭
আহলে বাইত সম্পর্কে	৩৮
শিয়াদের বারো ইমাম সম্পর্কে	৩৮
শিক্ষাদান পদ্ধতি	৪০
আরব ঐতিহ্য রক্ষা	৪২
ভারতীয় অপসংস্কৃতি	৪৩
আমাদের যত মন্দরীতি	৪৪
আরবি ভাষা ও দীনি এলেম	৪৫
জিয়ারতে হারামাইন প্রসঙ্গে	৪৫
হযরত ঈসা (আ)-কে সালাম পৌঁছিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে	৪৬

নসিহতনামা

ভূমিকা	৪৯
প্রয়োজনীয় বিষয় অগ্রাধিকার দেওয়া	৫০
পরামর্শ ও ইস্তেখারা	৫১

উপায় অন্বেষণ ও লক্ষ্যে স্থির থাকা	৫৩
নীতিনৈতিকতা	৫৪
বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা	৫৫
সৎসঙ্গ	৫৫
পরিকল্পনা	৫৫
বেকার হয়ে না থাকা	৫৫
সকাল-সন্ধ্যার আমল	৫৬
উভয়সংকটে করণীয়	৫৭
সুস্থতা ও রোগের চিকিৎসা	৫৭
সফরের আদব	৫৮
ভাবিয়া করিও কাজ	৫৯
শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা	৫৯
প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন	৫৯
সরকারি চাকুরির জ্ঞান	৫৯
মজলিসি আদব	৬০
রাগ নিয়ন্ত্রণ	৬০
গালিগালাজ না দেওয়া	৬১
ভালো গুণ অর্জন	৬১
আলেমদের সংশ্রব	৬১
বিপদগ্রস্তকে দেখতে যাওয়া	৬২
বিপদের দোয়া	৬২
আদব রক্ষা	৬২
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় থাকা	৬৩
জীবন হলো গনিমত	৬৩

হেদায়াতনামা

সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে	৬৭
শিল্পী, কারিগর ও পেশাজীবীদের উদ্দেশ্যে	৭০
কট্টরপন্থি সুফি ও ওয়ায়েজদের উদ্দেশ্যে	৭১
পীর ও শায়খের সন্তানাদির উদ্দেশ্যে	৭৩
আলেমদের উদ্দেশ্যে	৭৫
মুসলিম সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে	৭৭
প্রশাসক ও আমলাদের উদ্দেশ্যে	৭৮

প্রথম ওসিয়ত

আকিদা ও আমল প্রসঙ্গে

আকিদা ও আমলের ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে এবং সব সময় এ দুটো বিষয় নিয়ে চিন্তাফিকিরে মশগুল থাকবে। কোরআন ও হাদিস থেকে প্রতিদিন অন্তত এক পৃষ্ঠা পাঠ করবে। যদি তুমি (আরবি) পড়তে না পারো, তাহলে কারও কাছ থেকে অনুবাদ শুনে নেবে। আকিদা-বিশ্বাসের প্রশ্নে পূর্বসূরী আহলে সুন্নতের মত ও পথ অনুসরণ করবে। যেসব বিষয়ে তারা অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করেননি, সেসব বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। যুক্তিবিদ্যার অনর্থক ও সংশয় সৃষ্টিকারী অগভীর বিষয়আশয়ে মনোযোগ দেবার কোনো প্রয়োজন নাই। ফিকহশাস্ত্রের শাখাগত মাসআলায় ওইসব আলেমগণের অনুসরণ করবে যারা একই সাথে ফিকহ ও হাদিস বিষয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন। ফিকহশাস্ত্রের প্রতিটি প্রশ্নে প্রথমে কোরআন ও সুন্নাহ সামনে রাখবে, যদি এ দু'য়ের সাথে মিল থাকে তবে গ্রহণ করবে, নয়তো বাতিল মালের মতো ছুঁড়ে মারবে। উম্মতের জন্য যেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করা প্রয়োজন, সেসব ক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর মূলমর্মের অনুসরণ করতে হবে। এ দুই উৎস থেকে কখনই মুখ ফেরাবে না। আর এমন ফকিহদের অনুসরণ করবে না যারা একজন আলেমের অন্ধ-অনুসরণ (তাকলিদ) করতে গিয়ে সুন্নাহকে ত্যাগ করেছে। এমন ফকিহদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, বরং তাদের থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

দ্বিতীয় ওসিয়ত

সৎকাজের আদেশ বিষয়ে

আমর বিল মা'রুফ বা সৎকাজের আদেশ বিষয়ে আমার মনে যে ভাবনার উদয় হয়েছে, তা এই : শরিয়তে যা কিছু ফরজ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয়কে ইসলামের মৌলিক চিহ্ন (শি'আর) বানানো হয়েছে, সেসব বিষয়ে তোমার অবস্থান হবে খুবই কঠোর। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে এবং গোনাহের কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করবে। যেসব লোক সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধাজ্ঞায় শিথিলতা প্রদর্শন করে, তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না, বরং তাদের বিরোধিতা করবে।

কিন্তু শরিয়তের যেসব বিষয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন [তা ওয়াজিব কিংবা নাজায়েজ হওয়াটা প্রশ্নাতীত প্রমাণিত নয়], কেউ যদি সেসব কাজ করে, তবে তাকে হাদিস উল্লেখ করে সেই কাজ করা বা না করার দাওয়াত দেবে।[১] ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট। তোমার মত তাদের উপর চাপিয়ে দেবে না।

---

[১] যেমন নামাজে জোরে আমিন বলা, সংগীত শোনা কিংবা দাড়ি রাখা ইত্যাদি বিষয় মতবিরোধপূর্ণ। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম এসব বিষয়ে একাধিক মত দিয়েছেন। কেউ দাড়ি রাখা ওয়াজিব বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন সুন্নত বা মুস্তাহাব। কেউ সংগীত শোনা জায়েজ বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন নাজায়েজ। এখন কারও কাছে যদি দাড়ি ওয়াজিব হওয়া কিংবা সংগীত শোনা নাজায়েজ হওয়ার দলিল অধিক শক্তিশালী মনে হয়, তবে সে অবশ্যই তা বলবে ও পালন করবে। কিন্তু বিপরীত মতের লোকজনকে তা মানতে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ ইখতিলাফ (মতবিরোধ) রুখসত (ছাড়) তৈরি করে।

তৃতীয় ওসিয়ত

পীর-মুরিদ প্রসঙ্গে

এখনকার যুগে কোনো পীরের হাতে হাত রাখা কিংবা মুরিদ হওয়া উচিৎ নয়, কারণ তারা বিভিন্ন বেদআতি কাজে লিপ্ত। তাদের বিশালসংখ্যক ভক্ত-মুরিদান আর কেরামতি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। কারণ আমজনতার কাজই হলো বাড়াবাড়ি করা, এর সাথে হকপন্থি হওয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। দু-চারজন হক্কানি পীর ছাড়া এ যুগের আকছার পীরই কেরামত-ব্যবসায়ী।[২] লোকজনও তাদের ভেল্কিবাজি আর কথার মারপ্যাঁচকে 'কারামত' ভেবে বসে। অল্পকথায় তোমাদেরকে তাদের কেরামতির রহস্য বলছি। তাদের সবচেয়ে বড় কেরামত দুটো :

- ইশরাফ (মনের গোপন কথা বলে দেওয়া)
- ইনকিশাফ (ভবিষ্যৎ বলা)

এই ইশরাফ ও ইনকিশাফ দেখানোর অনেক কৌশল আছে—এর মধ্যে

[২] কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি (রহ) বলেন, শাহ সাহেবের এ নসিহতের উদ্দেশ্য মোটেও এই নয়–সব পীরই মন্দ, কারও হাতে বায়আত হওয়া যাবে না, কিংবা কোনো হক্কানি পীরের কাছ থেকে কারামত প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। ... বরং এ নসিহতের উদ্দেশ্য হলো কেরামতি কিংবা তেলেসমাতি দেখে কারও মুরিদ হওয়া যাবে না, এবং এ ধরনের কিছু প্রকাশ পাওয়া কারও হক হওয়ার দলিলও নয়। যে পীর শরিয়তবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত নন, এবং তাকওয়াবান ও প্রত্যেক মুরিদকে তার অবস্থা বুঝে তাকে সঠিক পথে চালিত করার শক্তি রাখেন–এমন পীরের হাতে বায়আত হতে কোনো সমস্যা নাই।

বাতায়ন থেকে প্রকাশিত বই

- বঙ্গবিজেতা বখতিয়ার – মুহাম্মাদ সাদ সাকী
- হিন্দুস্তান : ব্রিটিশ আগ্রাসনের আগে ও পরে – হুসাইন আহমদ মাদানি
- বুদ্ধিবৃত্তির নববি বিন্যাস – যুবায়ের বিন আখতারুজ্জামান
- ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ সালমান মানসুরপুরি
- ১৮৫৭ সিপাহি বিপ্লবের ইতিবৃত্ত – মুহাম্মাদ হাসিবুল হাসান
- ঈশা খাঁ – মহিম জোবায়ের
- খিলজি শাসন – হুসাইন আহমাদ খান
- ওসিয়ত ও নসিহত – শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি
- কলবুন সাকিম – মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
- ভাষাজ্ঞান – হাবীবুল্লাহ সিরাজ
- ইসলামি রাষ্ট্রচিন্তার পুনর্গঠন – মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি

প্রকাশিতব্য বই

- ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবদান – সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি
- ঔপনিবেশিক ভারত – ইমরান রাইহান
- ফকির আন্দোলন – এহসানুল্লাহ জাহাঙ্গীর
- সিরাজুদ্দৌলা – আমিরুল ইসলাম ফুআদ
- বাঙ্গালী মুসলমানের পরিচয় – খন্দকার ফজলে রাব্বি
- তিতুমীর – মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম
- তুঘলকি সাম্রাজ্যের ইতিহাস – আমিন আশরাফ